ইসলামী সংস্কৃতির মর্ম কথা (পর্ব-১)

মার্মেডিউক পিকথল

সৃংস্কৃতির অর্থ উৎকর্ষ বা অনুশীলন। অধুনাতন ও সাধারণভাবে একক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির বিশেষ অর্থ হচ্ছে মানবমনের উৎকর্ষ। অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে ইসলামী সংস্কৃতির সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কেননা ইসলামী সংস্কৃতি কখনো কেবলমাত্র কোন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপূরক হতে পারে না। আরো পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে, ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূরণের বাহন হতে পারে না; এবং এখানেই বিভিন্ন সংস্কৃতির সংগে তার পার্থক্য। এটা সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত সত্য যে, ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য সীমিত পর্যায়ে কোন ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যক্তি-সমষ্টির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন নয়- বস্তুতঃ সামগ্রিকভাবে গোটা মানব-জাতির অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন। অন্যায়, অবিচার ও অসহিষ্ণুতা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোন দেশে শিল্প ও সাহিত্য-সাধনার কোন পরিসরের কাজই ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যয়ানুগ হতে পারে না। যত বিরাট ও কীর্তিময় হোক না কেন, কোন যুদ্ধ কিংবা সন্ধি-চুক্তির সাফল্যকে ইসলামের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাফল্যের ফল বলে অবিহিত করা যেতে পারে না। ইসলামের লক্ষ্য আরো প্রশস্ততর এবং এর দৃষ্টি-দিগন্ত আরো দূর-বিস্তারী। প্রকৃতপক্ষে, সার্বজনীন মানবিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ইসলামের চুড়ান্ত লক্ষ্য- ইসলামের বিরামহীন অভিযাত্রা এই আদর্শের লক্ষ্যভূমির পথে অগ্রসরমান। ধর্ম হিসেবে ইসলাম নিজস্ব পরিসরে ও নিজের শ্রেণীগত অগ্রগতির পর অন্য যে কোন ধর্মের চেয়ে অধিকতর ও ব্যাপক পর্যায়ে মানবীয় প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে থাকে। শক্তি হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের পর ইসলাম যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছে, অন্য সব ধর্ম, সভ্যতা ও দর্শনের সম্মিলিত সাফল্যের সংগে তার তুলনা করা যেতে পারে। মানে, ইসলামের সাংস্কৃতিক অবদানকে বিশ্বের সমস্ত ধর্ম সভ্যতা ও কৃষ্টির সামগ্রিক অবদানের সংগে এক পাল্লায় ওজন করা যেতে পারে।

প্রতীচ্যে শিল্প ও সাহিত্যচর্চাকে- যাকে সংস্কৃতির একটা প্রাসংগিক বা গৌণ দিক বলা যেতে পারে- প্রায় উপাসনার অনুরূপ যে অপরিসীম গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে, একজন মুসলমান তাতে অবাক না হয়ে পারে না। কেননা, মনে করা হয়, এই যেন ঠিক- এই যেন বিরাট এক সত্য এবং এর সৃষ্টিই মানব জাতির সর্বোচ্চ লক্ষ্য। মুসলমানরা সাহিত্যিক, শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক সাফল্যকে উপেক্ষা করে না- কখনো অবজ্ঞার চোখে দেখে না। কিন্তু এটা সত্য যে, তারা এগুলোকে অনেকখানি চলার পথে পাওয়া আশীর্বাদের আলোকে বিচার করে- তাদের চোখে এ হচ্ছে লক্ষ্য পথের একটা সহায়ক উপকরণ কিংবা পথযাত্রীর শ্রান্তি অপনোদনের মত। তারা এই সহায়ক বস্তু এবং শ্রান্তি অপনোদনের মাধ্যমকে পূজা বা প্রতীক আশ্রয়িতার পর্যায়ভুক্ত করে না।

বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যে ইসলামের সামগ্রিক অবদান এই সহায়ক উপকরণ ও শ্রান্তি অপনোদনের ভিত্তিতেই সম্প্রসারিত হয়েছে। সূক্ষ্মতম কাব্য-সাহিত্য ও ভাস্কর্য এগুলোর অন্যতম এবং এ দুই উপর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। এর সব কিছুই এক নেতাকে স্বীকৃতি দান করে, এক পথনির্দেশের অসুসরণ করে, এক কেবলা বা লক্ষ্যাভিমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। নেতা হচ্ছেন মুহাম্মদ (সাঃ), পথ-নির্দেশ হচ্ছে আল-কুরআন, আর মনজিলে-মাকসাদ বা অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্।

ইসলামী সংস্কৃতি বলতে- তা যে-কোন সূত্র থেকেই উদ্গত হোক না কেন- আমি ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের লব্ধ সংস্কৃতি বোঝাতে চাই নি। আর যে-কোন উৎস থেকেই এর বিকাশ হোক না কেন, তা-ও বড় কথা নয়। বস্তুতঃ ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আমি এমন একটি ধর্মমত কর্তৃক স্বীকৃত সংস্কৃতির কথা বোঝাতে চাইছি, যাতে মানবিক অগ্রগতিই একটা নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য।

যে-সব মানুষ আল-কুরআনের পথ-নির্দেশ অনুসরণ করে এবং তার বিধানসমূহ মেনে চলে, তাদের প্রতি মহাগ্রন্থ এ জগতে ও পরলোকে সাফল্যের যে প্রতিশ্রুতি দান করেছে- আল্-কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত কোন ব্যক্তিই তা অস্বীকার করতে পারে না। এর চুড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিকভাবে গোটা মানব-জাতির জন্যে সাফল্য অর্জন। আর মানুষের সৃজনধর্মী অবদান ও মৌলিক গুণগুলোর বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের ওপরই এ সাফল্য বির্ভরশীল।

উন্মেষশীল মুসলিম সমাজের কোন প্রসারণ-ব্যবস্থা আল্-কুরআন কিংবা মহানবীর কোন নির্দেশে বা আল-হাদীসে অনুমোদিত না হলে বুঝতে হবে, তা ইসলাম-বহির্ভূত এবং ইসলামী বিধি-ব্যবস্থার বাইরেই তার অনৈসলামিক মূলানুসন্ধান করতে হবে। সাফল্যের পরিপন্থী হওয়ার কোন কারণ না ঘটলেও মুসলমানরা তাদের সমাজ-জীবনে এগুলোর সংযোজন বা ফল গ্রহণ দ্বারা কোনরূপ কুফল আশা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে কোন কর্মপন্থা আল-কুরআনের সুস্পষ্ট কোন বিধির পরিপন্থী হলে বুঝতে হবে, তা�ই ইসলাম-বিরোধী; আর এটা সাফল্য ও অগ্রগতির পরিপন্থী এবং একে গ্রহণ করলে মুসলমানরা নিঃসন্দেহে এক অনিবার্য ধ্বংসের শিকার হবে।

> গোড়ার দিকে পৌত্তলিক আরবদের প্রতীক-পূজা এবং এর পংকিলতা ও মত্ততাময় রূপ-বৈচিত্র্যের সংগে সম্পৃক্ত ছিল বলে কতিপয় শিল্পকলাকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করে। কারণ, সমাজের এই প্রতিকবাদিতা ও এর পাপসর্বস্ব বৈশিষ্ট্যের মূলোৎপাটনের প্রয়োজন অনিবার্য ছিল। তবে সুকুমার বৃত্তিজাত কাজগুলোর অনুরূপ একজাতির শিল্প-পদ্ধতির অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিতা ও অন্যবিধ শিল্প-পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতা- উভয়েরই গুরুত্ব অধস্তন বা গৌণধর্মী ছিল। কেননা, ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য মানব-জীবনের বাড়তি উপকরণগুলোর সৌন্দর্যবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিশীলন নয়- বস্তুতঃ সামগ্রিক মানব-জীবনকে সুন্দরতর, মহত্তর, মহিমময় করে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য।

অধুনা পাশ্চাত্য বিশ্বে এক বিরাট বুদ্ধিজীবী মহল এই অভিমত পোষণ করেন যে, কোন সমাজ শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের একটি মুষ্টিময়ে অংশের শিল্প-সংস্কৃতির অনুশীলন সেই সমাজ ও সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দাবীর পক্ষে বিরাট কারণ হয়ে দাঁড়ায়; যদিও প্রচলিত সমাজ-আওতায় বাধ্য হয়েই এই সমাজের বেশীর ভাগ মানুষকে কুৎসিত ও অধৎপতিত জীবন যাপন করতে হয়। শুধু তাই নয়- সেখানকার অপর একটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর অভিমত হচ্ছে, কোন জাতির সংখ্যালঘু অংশের সাহিত্য ও শিল্প-সাধনার প্রয়াসই সে-জাতির বৃহত্তম অংশের কদর্য জীবন ও দাসবৃত্তির চরম গ্রানির যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ডের সংবাদপত্র মহলের একটি আলোচনার কথা আপনাদের কারো কারো নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। প্রশ্নটি ছিল এইঃ মনে করুন, একটি কক্ষে একটি জীবন্ত শিশুর সংগে একটি সুবিখ্যাত ও অনুপম সুন্দর গ্রীক ভাস্কর্য মূর্তি রয়েছে; সমপর্যায়ের মূর্তির মধ্যে এ মূর্তিটি অসাধারণ ও অতুলনীয়; সুতরাং এর স্থান পূরণ অসম্ভব। এখন ধরুন, কক্ষটিতে আগুন লেগেছে, আর মূর্তি ও শিশুটির মধ্যে কেবল একটিকেই বাচানো সম্ভব; এ অবস্থায় কাকে বাঁচাতে হবে? আমার মনে আছে, প্রায় অধিকাংশ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও পদস্থ ব্যক্তি হতভাগ্য শিশুটির সামনে মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করে সেই অনুপম গ্রীক ভাস্কর্য মূর্তিটি রক্ষার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, প্রতিদিন লাখ লাখ শিশুর জন্ম হয়; পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য-শিল্পের সেই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনটির স্থান পূরণ কখনো সম্ভব হবে না। কোন মুসলমান কখনো এই অমানবিক দৃষ্টিভংগি-প্রসূত অভিমত গ্রহণ করতে পারে না, কিংবা এই দৃষ্টিভংগির পরিপোষক হতে পারে না। এই দৃষ্টিভংগি হচ্ছে প্রতীকবাদিতা তথা প্রতিমা পূজার সর্বশেষ মার্জিত রূপ।

দূরদৃষ্টি ও পরিণামদর্শিতা ইসলামের বৈশিষ্ট্য। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে, পূর্বাহ্নেই ফলাফলের কল্পরূপ সামনে রেখেই ইসলাম কর্মব্রতী হয় এবং গোটা মানব-জাতির জন্য একটা উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করে যায়। অবশ্যি প্রতিটি মুসলিম আল্লাহ্‌র কাজে তার নিজস্ব জীবনকে উৎসর্গীকৃত মনে করে- আর আল্লাহ্‌র কাজকে সে মানবতার কাজ বলেই মনে করে। কিন্তু যত নগণ্য বলে মনে হোক না কেন, কোন মানুষের জীবনকেই সে কখনো মানুষের তৈরী কোন জিনিসের জন্য উৎসর্গ করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহ্‌র পথ-নির্দেশ এবং মানব-জাতি সম্পর্কে তার উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসহীনতাই শিল্প-কীর্তিকে উপাসনার সমপর্যায়ের বা পূজার বেদীতে অধিষ্ঠিত করার পেছনে কারণ যুগিয়েছে।

বিতর্কের বিষয় হচ্ছেঃ বহু শতাব্দীব্যাপী মানুষের সৃষ্টি-সাধনার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হচ্ছে এই জিনিসগুলো; সৌন্দর্য ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে- আর মানুষেরও দিন দিন অবনতি হচ্ছে; সুতরাং আমাদের সামনের একটি আদর্শ হিসেবে অতীতের এই সুন্দরতর সৃষ্টিগুলোর প্রতি অবশ্যই আমাদের মর্যাদা আরোপ করতে হবে। এ যুক্তি হচ্ছে নৈরাশ্যবাদিতার নামান্তর মাত্র। আর ইসলাম হচ্ছে আশাবাদী। তবে ইসলামের এই আশাবাদী রূপ ভলটেয়ারের ব্যাংগাত্মক চরিত্র সেই অদ্ভুত দার্শনিক ডাক্তার প্যাংলোস-এর আশাবাদিতার অনূরূপ নয়। ডাঃ প্যাংলোস প্রায়ই অভিভূত কণ্ঠে বলতেন, �সম্ভাব্য বিশ্বাসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্টতম এই বিশ্বে সব

কিছুই উৎকৃষ্টতম কোন কিছুর জন্যে।' এ হচ্ছে এমন একটি মন্তব্য, বা চিন্তাহীনের কাছে আশাবাদিতার স্বর্গ-কল্পনা বয়ে বেড়ায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে অদৃষ্টবাদিতা, যা নৈরাশ্যবাদেরই আর একটি রূপ। ইসলাম অদৃষ্টবাদী নয়। হ্যাঁ আমি সে কথারই পূনরাবৃত্তি করছি। মুসলমানের অদৃষ্টবাদিতা সম্পর্কে যত কথা বলা হয়েছে এবং যত কিছু লেখা হয়েছে তা সত্ত্বেও এই শব্দটির সাধারণ স্বীকৃত অর্থের দিক থেকে ইসলাম অদৃষ্টবাদী নয়। ইসলাম প্রচলিত অবস্থাকে অপরিহার্য অশুভ অবস্থা কিংবা মন্দভাগ্য হিসেবে গ্রহণ করতে মানুষকে নির্দেশ দেয় না; বস্তুতঃ ইসলাম অগ্রগতির তাগিদে বিরামহীন কর্ম সাধনায় ব্রতী হতে মানুষকে নির্দেশ দেয়।

ইসলামের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে মানবিক প্রগতিমুখী। নানাবিধ অবজ্ঞা ও নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়ে একদিকে মানুষের দৈনন্দিন, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে- অন্যদিকে সে সংগে তার প্রতিটি মনোভংগি তথা তার মন ও আত্মার প্রতিটি আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে ইসলাম এই মানবিক প্রগতির সঠিক পথ প্রদর্শন করেছে। এই অনুজ্ঞা-নিষেধাজ্ঞাগুলো একটি পূর্ণাংগ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন-ব্যবস্থার বিধিভুক্ত হয়েছে। এ হচ্ছে এক কার্যকরী বা বাস্তবানুগ ব্যবস্থা। কেননা, এমন এক সাফল্যের সংগে এ ব্যবস্থার প্রয়োগ হয়ে এসেছে, যা ইতিহাসের এক পরম বিস্ময়। অনেক লেখক ইসলামের এই বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে বাইরের কতকগুলো কারণ নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের এ স্বকপোল-কল্পিত কারণগুলোর মধ্যে আশেপাশের জাতিগুলোর দূর্বলতা, বেপরোয়াভাবে তরবারি ব্যবহার আর সময়ের সুযোগ গ্রহণ প্রভৃতি অন্যতম।

কিন্তু তাঁরা কি করে এর ব্যাখ্যা করবেন যে, মুসলমানরা যে-পর্যন্ত পবিত্র বিধানের বিশেষ একটি অনুজ্ঞাকে নিষ্ঠার সংগে পালন করেছে, সে-পর্যন্ত তারা সেই অনুজ্ঞার পরিসীমায় সফলকাম হয়েছে এবং যখনি তাঁরা এর অনুসরণে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে, তখনি তাদেঁর নিশ্চিত ব্যর্থতাকে বরণ করতে হয়েছে; আর কিভাবেই বা এর ব্যাখ্যা করবেন যে, আল-কুরআন ও ইসলামের মহিমান্বিত নবীর নির্দেশিত বিধান যে সমগ্র মানব-জাতির জন্য কিংবা সমগ্র মানব-জাতির অনুকরণীর স্বাভাবিক বিধান- এ ধারণা ব্যতিরেকেও মুসলমানদের ওপর বিধিবদ্ধ কর্মপন্থা অনুসরণ করে কোন অমুসলমানও সব সময়ই সেই কর্মের পরিসরে সফলতা অর্জন করেছেন?

প্রকৃতপক্ষে এই বিধানগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইন। মানুষ তার চরম দূর্ভোগের দিনে- অথবা বলা যায়, জাতি তার দূর্দিনেই এই বিধান লংঘন করে থাকে। কোন ব্যক্তি-বিশেষের গবেষণা বা নিরীক্ষায় এই বিধানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে ইতিহাসের সুদীর্ঘ কাল-পরিক্রমায় কোন জ্ঞানব্রতী ছাত্র ও চিন্তাবিদ শুধু বিক্ষিপ্ত-ভাবে এর অংশ-বিশেষের সন্ধান পেতে পারেন। নবী বা প্রেরিত পুরুষগণই এই সার্বজনীন বিধানের উদ্‌গাতা অর্থাৎ কোন নবীর মাধ্যমেই এই বিধান প্রকাশিত হতে হবে। শুধু এইটুকু ছাড়া এই বিধানগুলো আমাদের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ নিয়ামক প্রাকৃতিক আইনের মতই স্বাভাবিক- যার বিরুদ্ধবাদিতার কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

অন্যান্য ধর্মমত পরলোকে তার সে-সব অনুগামীদের সাফল্য লাভের প্রতিশ্রুতি দান করে, যারা এই পৃথিবীতে দুঃখ দৈন্য ও কৃচ্ছতা বরণ করে এর যোগ্যতা অর্জন করে। ইসলাম সকল মানুষকে যথাক্রমে ইহলোক ও পরলোকে সাফল্য ও ফলভোগের প্রতিশ্রুতি দান করে। এ সাফল্যের জন্য তাদের কেবলমাত্র কয়েকটি সাধারণ আইন ও সহজ সরল জীবন-বিধান মেনে চলতে হবে। খাঁটি মুসলমানের এ-জীবন ও পর-জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য চিহ্নিত হয় নি; কেননা, আল্লাহ্ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর তথা স্বর্গ ও মর্তের প্রভু এবং ইহজীবন ও পর-জীবনের সর্বময় ক্ষমতার অধিপতি। যারা আল-কুরআনের জীবন-বিধান অনুসরণ ক'রে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর আত্মসমর্পণ করে, তাদের মৃত্যুতে নয়- বস্তুতঃ এ পার্থিব জীবনেই পরজীবনের যাত্রা শুরু হয়। আমাদের প্রতি নির্দেশে মহানবী (সাঃ) ঠিক এ-কথাই ঘোষণা করেছেনঃ

'মৃত্যুর আগেই মৃত্যুবরণ কর।'

ইসলাম এই পৃথিবীতে যে সফলকামিতার প্রতিশ্রুতি দান করেছে, তা অন্য অনেকের মূল্যের বিনিময়ে কোন একজন মানুষ বা ব্যক্তি-বিশেষের সাফল্য নয়; কিংবা অন্য জাতির অধঃপতন ক্ষতি ও নৈরাশ্যের বিনিময়ে কোন এক জাতির সাফল্য নয়; প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের সাফল্য সামগ্রিকভাবে মানব-জাতির সাফল্য। বিশ্বের সর্বত্র প্রতিটি মসজিদ থেকে দিনে পাঁচবার এই আহ্বানই ঘোষিত হয়ঃ

'এস, ফালাহ্‌তে শরীক হও! এস, ফালাহ্‌তে শরীক হও।' অথবা, 'কল্যাণ-অভিসারের পথে এস! কল্যাণ-অভিসারের পথে এস।'

আরবী শব্দ ফালাহ্ কথাটির অর্থ কল্যাণ-অভিসার বা অনুশীলনের মাধ্যমে সাফল্যলাভ। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত ঠিক অনুরূপ আর একটি আরবী শব্দ রয়েছে, পারিভাষিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর মৌলিক বা অন্তর্নিহিত অর্থটি আমরা প্রায়ই বিস্মৃত

হই। সে শব্দটি হচ্ছেঃ যাকাত বা "অতিরিক্ত ভাগ যা অনুশীলন কিংবা সরাসরি ছাঁটাই বা বণ্টেনের মাধ্যমে ফলন বা বৃদ্ধির কারণ ঘটায়।" এই নামেই ইসলামী দরিদ্র-করের নামকরণ করা হয়েছে। আল-কুরআনে "সালাত" বা উপাসনার সমপর্যায়ের কর্তব্য হিসেবে বার বার যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ যাকাত সমাজের উৎকর্ষ-লব্ধ ক্রম-উন্নয়নশীল অগ্রগতির একটি প্রধান কারণ।

মহানবী (তাঁর উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেনঃ "ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করতে হবে এবং গরীবের মধ্যে তা বণ্টন করতে হবে।" এ দরিদ্র-কর নিয়মিত ও সঠিকভাবে সংগ্রহ করার সময় মুসলিম সমাজের অবস্থা অগ্রগতির এমন এক উচ্চতম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বণ্টনকারীদের ব্যাপক অনুসন্ধানের পরও যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কোন দুঃস্থ ও বঞ্চিত মুসলমানকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হত না। সুতরাং যাকাতের সংগৃহীত অর্থ সাধারণ জনকল্যাণের কাজে ব্যয় করা হত। আল-কুরআনের ভাষায়ঃ

"সে সত্যি সফলকাম, যে মানবতার বিবর্তন ও বিকাশ সাধনে সহায়ক হয়েছে। আর সে সত্যি ব্যর্থকাম, যে এর বিকাশ রোধ করেছে এবং একে অনশনে রেখেছে।"

আল-কুরআনের আর-এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ

"সে সফলকাম হয়েছে, যে আত্মবিকাশ সাধন করেছে (এবং পবিত্রতা লাভ করেছে); আর যে তার স্রষ্টা প্রভুর নাম স্মরণ করে এবং সালাত কায়েম করে।"

অনেকে ভাবতে পারেন যে, এগুলো হচ্ছে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কতকগুলো ভাবময় ধর্মীয় অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু আসলে, বাস্তবভিত্তিক না হলে ইসলাম সম্পূর্ণ অর্থহীন। আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে, বাস্তব মূল্যবোধ না থাকলে ইসলামের কোন মানেই হত না এবং এই সব অভিব্যক্তি ইসলামে কেবলমাত্র নিস্প্রাণ হরফ-সমষ্টির অন্তরালে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। কেননা, এগুলোকে বৃহত্তর পর্যায়ে সাহায্য, সেবা ও দানশীলতার একটি সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে বাস্তব রূপ দান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম ভিন্ন এ ধরনের বাস্তবভিত্তিক, এমন ব্যাপক ও মহত্তর প্রচেষ্টা আর কোথাও হয় নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ-ব্যবস্থা মুসলিম-বিশ্বের যাবতীয় সামাজিক সমস্যার সমাধান করেছে। আল-কুরআন আমাদের বলে, খাঁটি ধর্ম বাস্তববাদী-তত্ত্ব-নির্ভর ও অনুষ্ঠান-সর্বস্ব নয়।

"পূর্ব ও পশ্চিম অভিমুখে তোমাদের মুখ ফেরানোর মধ্যে কোন সাধুতা বা ধর্মনিষ্ঠা নেই; প্রকৃতপক্ষে, কোন সদাচারী ও ধর্মনিষ্ঠ, যে আল্লাহ্‌ ও শেষ বিচার দিন, ফেরেশতাগণ ও ঐশী গ্রন্থ এবং নবীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, আর আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় তার সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, অনাথ-এতিম, অভাবগ্রস্ত, গৃহহীন ও সায়েলদের সাহায্য এবং দাসদের মুক্তিসাধনে দান করে; আর তারা, যারা নিয়মিতভাবে আল্লাহ্‌র উপাসনা করে দরিদ্রদেরকে (তাদের) ন্যায়ানুগ হিসসা (অংশ) দান করে এবং যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে তা পালন করে- আর যারা আপদে ও দুর্দশায় ধৈর্য ধারণ করে। এরাই হচ্ছে তারা, যারা অকপট ও সত্যনিষ্ঠ। এরাই হচ্ছে তারা যারা প্রকৃত শুদ্ধাচারী- যারা আত্মাকে দুষ্কৃতিমুক্ত রাখে।"

আল-কুরআনে অনেক জায়গায় এ কথাটি আছেঃ "যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকাজ করে;" অর্থাৎ যারা আস্থাবাদী ও সৎকর্মশীল। পবিত্র কুরআনে বার বার এ উক্তি উচ্চারিত হয়েছে : "যারা বিশ্বাস করে এবং আর কোন কিছুই করে না।" মানে যারা বিশ্বাসী, কিন্তু কর্মবিমুখ, ইসলামে তাদের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। "যারা বিশ্বাসী, কিন্তু দুষ্কৃতিকারী", তাদের কথা ধারণাই করা যায় না- তারা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। কেননা, ইসলামের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর মানুষের আত্মসমর্পণ। সুতারাং আল্লাহ্‌র বিধান বা আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র আইন হচ্ছে নিরন্তর উদ্যমময় ও গতিশীল- অলসতা বা কর্মবিমুখতার স্থান এতে নেই।

ইসলামের স্বর্ণযুগে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য চিহ্নিত হয়নি। সব রকমের শিক্ষাকেই ধর্মীয় অংগনে স্থান দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালের জনৈক ইউরোপীয় লেখকের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। এতে বলা হয়েছেঃ ইসলামের এক গৌরবময় কীর্তি হচ্ছে, ইসলাম কুরআন, হাদীস ও মুসলিম বিধানশাস্ত্র ফিকাহ্‌র অধ্যয়ন ও অনুশীলনের অনুরূপ অন্য সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাকেও সমান আসন ও মর্যাদা দান করেছে এবং মসজিদে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মসজিদে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্‌র ওপর আলোচনার সংগে একইভাবে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভেষজ বিজ্ঞান এবং

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপরও আলোচনা করা হত। কেননা, স্বর্ণযুগে মসজিদই ছিল ইসলামের বিশ্ববিদ্যালয়। দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের প্রতি ক্ষেত্র, প্রতি প্রান্ত থেকে লব্ধ যুগের সমস্ত জ্ঞানধারাকে সেদিন মসজিদের অংগনে সাদরে বরণ করা হত। এই আশ্চর্য বৈচিত্র্যময় সম্মিলন আর সর্বজ্ঞানের চরম উৎকর্ষই প্রাচীন মুসলিম মনীষীদের চিন্তাধারায় এক অনুপম বৈশিষ্ট্য দান করেছে- যা তাঁদের প্রতিটি পাঠকের মনেই রেখাপাত করে। এ হচ্ছে বিদগ্ধ মনের এক শান্ত স্থির মহিমময় রূপ।

ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং ধর্মবাদের মত কোন মতবাদের অস্তিত্ব নেই; কেননা, খাঁটি ধর্ম মানুষের উদ্যম ও কর্মধারার সমগ্র পরিসরকেই তার আওতাভুক্ত করে। পবিত্র কুরআনে ভাল ও মন্দ তথা সুকৃতি ও দুষ্কৃতির মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা হয়েছে। সুকৃতি মানুষের বিকাশ ও উন্নয়নের সহায়ক, আর দুষ্কৃতি এর পক্ষে চরম হানিকর। ইসলাম মুক্তবুদ্ধিবাদী ধর্ম। এ ধর্মে সে মানুষের স্থান নেই, যে সেন্ট অগাস্টিনের সংগে স্বর মিলিয়ে বলেঃ Credo quia absurdum est- আমি বিশ্বাস করি, যেহেতু এটা অলৌকিক ও অবিশ্বস্য। আল-কুরআন বারবার অযৌক্তিক বা মুক্তবুদ্ধি-বর্জিত ধর্মকে বাতিল ঘোষণা করেছে। কেননা, কুরআনের দৃষ্টিতে যুক্তিহীন ধর্মমত ধর্ম হিসেবে সম্পূর্ণ বাতিল ও অন্তঃসারশূন্য। বারবার কুরআন ধর্মীয় ক্ষেত্রে যুক্তি ও সাধারণ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের জন্যে মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সমস্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এটা প্রমাণ করে যে, মানবিক অগ্রগতির জন্যে অপরিহার্যভাবে ব্যাপক মুক্তবুদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। এবং সে সংগে ইতিহাস এ-কথাও প্রমাণ করে, যে-সব জাতি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস হারায়, তাদের অধঃপতন অনিবার্য। আল্লাহ্‌র প্রতি জাগ্রত বিশ্বাস এবং প্রশান্ত মুক্তবুদ্ধি- এ দুটো কি সংগতিবিহীন? পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর বেশ কিছুসংখ্যক চিন্তাবিদ মনে করেন, এ দুয়ের মধ্যে কোন সংগতি থাকতে পারে না। কিন্তু ইসলাম প্রমাণ করেছে, এদুটো বিষয় সম্পূর্ণাংগভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সমন্বয়শীল।

সাফল্যের ফলবাহী ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে প্রতিটি বৈষয়িক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতি অবিমিশ্র বিশ্বাসের সংগে মুক্তবুদ্ধির সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল। কারণ, ইসলাম পৃথিবীর ওপরে এমন কোন কিছুকেই এত পবিত্র মনে করে না, যা সমালোচনা-মুক্ত বা সমালোচনার নাগালের বাইরে। কেবল অসীম অলৌকিক শক্তিময় একজন মাত্র আছেন- অকল্পনীয় অদ্বিতীয় সত্তাময় এমন একজন, যাঁর একত্বে একবার বিশ্বাস স্থাপনের পর আর কোন আলোচনার অবকাশ থাকে না। তিনি সকলের জন্যে সার্বজনীনভাবে মংগলময় ও দয়ালু। তিনি মানুষকে যুক্তি প্রজ্ঞা ও কার্যকারণ নিরূপণের প্রতিভা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মুসলিম মনীষী লেখকরা মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম দান হিসেবে এ কার্যকারণ-জ্ঞানকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। যা শুভ ও কল্যাণকর তার অনুসরণ এবং যা মন্দ ও অকল্যাণকর তার পথ বর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যাতে সম্পূর্ণ অবাধে আল্লাহ্‌র নামে তার এই বিচার বুদ্ধি ও কার্যকারণ জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে, সে জন্যেই আল্লাহ্ তাকে এ ক্ষমতা দান করেছেন। আর এ উদ্দেশ্যের অনুগমনের ক্ষেত্রে পবিত্র সংবিধানে পথনির্দেশ ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রয়েছে।

ইসলামে কোন পৌরোহিত্যবাদ নেই। অন্যান্য ধর্মে সব রকম অধিকার ও কার্যক্রম অস্বাভাবিকভাবে পুরোহিত সম্প্রদায়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় এ-সব অধিকার ও দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের ওপর আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং এ প্রশস্ত দৃষ্টিভংগির ফলে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বপদ লাভ করেন।

কোন নর-নারীর জীবনের চলার পথে আলোক-সঞ্চারের পক্ষে একজন জ্ঞানহীন ব্যক্তি হচ্ছে তেলবিহীন একটি প্রদীপের মত। তাই এই যুক্তি-জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনের সংগে সার্বজনীন শিক্ষার নির্দেশ বিধৃত হয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ জ্ঞানানুশীলন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ। এভাবে তেরশ বছর আগে নর ও নারী উভয়ের জন্যেই সার্বজনীন শিক্ষা ইসলামের পবিত্র সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে পাশ্চাত্য সভ্যতা একে সাদরে বরণ করে নেয়। মহানবী (সাঃ) একথাও বলেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে (যদিও এ বর্ণনার উপযুক্ত নির্ভরযোগ্যতা নেই।):

জ্ঞানের সন্ধান কর, যদি সে জ্ঞান চীনেও থেকে থাকে।

নিম্নোক্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসটি থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, জ্ঞানানুশীলনের ওপরই কেবলমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি- জন-সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছেঃ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে জ্ঞান ছিনিয়ে নেবেন না; প্রকৃতপক্ষে, তিনি জ্ঞানসাধকদের পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে (রাজ্য) শূন্যতা সৃষ্টি করবেন। এর ফলে এমন অবস্থার উদ্ভব হবে যে, কোথাও কোন খাঁটি জ্ঞানী ব্যক্তি বা আলেম অবশিষ্ট থাকবে না। তখন মানুষ মূর্খদেরকে তাদের নেতা বা পথপ্রদর্শক হিসেবে বরণ করবে এবং তাদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করবে (নানা বিষয় সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাইবে) এবং তারা (সেই মূর্খ নেতাগণ) কোনরূপ জ্ঞান ব্যতিরেকেই ফতোয়া দান

করবে। (এর ফলে) তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

এ উক্তিতে ইসলামের বর্তমান অবস্থা সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। আমাদের মধ্যে এখন এমন বহু সংকীর্ণচিত্ত গোঁড়া আলেম দেখা যায়, যাঁদের জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে। তবে এখানে জ্ঞান শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশস্ততর এবং অধিকতর মানবীয়। এছাড়াও মাহনবী (সাঃ) বলেছেনঃ

জ্ঞান-সাধকের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্রতর।

তিনি আরো বলেনঃ

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে এক ঘন্টার নীরব চিন্তা ও গবেষণা এক বছরের উপাসনার চেয়েও উত্তম।

তাঁর আর-সব উক্তিতে আছেঃ যে জ্ঞানসাধনা করে, তার মৃত্যু নেই- সে অমর। যে জ্ঞান-সাধকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, সে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। প্রথমে যে জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছিল তা হল- বিচার-বুদ্ধি বা কার্যকারণ জ্ঞান। আল্লাহ্‌ বিচার বুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি। এর দ্বারাই আল্লাহ্‌ আমাদের কল্যাণ বিধান করেছেন, এবং এর সাহায্যেই আমরা সবকিছু বুঝি ও অনুধাবন করি, আর এর জন্যই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ ঘটে থাকে, এবং এর মধ্যেই পুরস্কার ও শাস্তির কারণ নিহিত রয়েছে। তিনি বলেনঃ জ্ঞানসাধকের কথা শোনা এবং অন্যদের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রেরণা সৃষ্টি ধর্মীয় উপাসনা-অনুশীলনের চেয়েও মহত্তর। যে জ্ঞান-সাধনার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে, সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় পদচারণা করে। জ্ঞান তার অধিকারীকে মন্দ থেকে ভাল কিংবা দুষ্কৃতি থেকে সুকৃতির পার্থক্য নিরূপণে সাহায্য করে; জ্ঞান বেহেশ্‌তগামী পথকে আলোকিত করে। উষর মরুতে এ আমাদের বন্ধু, নিবৃতবাসে আমাদের সমাজ, আর বন্ধুহীন অবস্থায় আমাদরে সহচর। এ সুখের পথের সন্ধান দেয় এবং দুঃখের গুরুভার বহনের শক্তি দান করে। বন্ধুদের মধ্যে এ হচ্ছে একটি ভূষণ এবং দুশমনদের বিরুদ্ধে এ হচ্ছে এক দুর্ভেদ্য বর্ম। দেখ! ফেরেশ্‌তাগণ জ্ঞান-সাধকের ওপর তাদের আলোর পাখা বিস্তার করেছে। যাদের জ্ঞান আছে, আর যাদের নেই- তারা কি সমপর্যায়ভূক্ত? জ্ঞানী ব্যক্তির স্থান ধর্মব্রতীর ওপরে; আর আমার স্থান তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অধস্তন ব্যক্তির ওপরে।

তিনি বলেন, একজন মানুষ নামাজ, রোজা, যাকাত, দান-খয়রাত ও হজব্রত অনুষ্ঠান এবং অন্যসব ধমীয় কর্তব্য পালন করতে পারে। কিন্তু জীবনে যে পরিমাণ সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সে পরিচালিত হয়েছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তাকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনি আরো বলেন, জ্ঞান আছে- অথচ যে তা জীবনে চলার পথে প্রয়োগ করতে জানে না, সে বইয়ের বোঝাবাহী একটি গাধার মত।

ইসলামে কোন অজ্ঞ মুসলমানের অস্তিত্বের কথা পবিত্র কুরআনে কখনো ধারণা করাও হয়নি এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও তা কখনো কল্পনা করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে, 'অজ্ঞ মুসলমান' কথাটি 'মুসলমান' পদবাচক সংজ্ঞার পরিপন্থী বা বিপরীতার্থক। ইসলামের গৌরবময় দিনে একজন 'দরিদ্র মুসলমানের' মত একজন অজ্ঞ মুসলমানকেও খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হতো।

(অনুবাদঃ সানাউল্লাহ্‌ নূরী)

সূত্রঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত "ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা" গ্রন্থ।

দ্বিতীয় পর্বঃ ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা

মার্মেডিউক পিকথল